দ্বিতীয় প্রবাস - ৮

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

আমেরিকা প্রবাসী আরো হাজারো অভিবাসী বাংলাদেশীদের মত আইনুল আর রাজ্জাকের ও প্রতি বছর বাংলাদেশে যাওয়া হয়ে ওঠেনা। আইনুলের বাবা-মা দু'জনই মারা গেছেন আজ অনেকদিন হলো। ওর বড় এক ভাই আর এক বোনও কাছাকাছি কোন এক শহরে থাকেন। ওদের বাংলাদেশে যাওয়া হয় কেবলমাত্র খুকু ভাবির বাবা-মায়ের জন্য। রাজ্জাকও দু'তিন বছরে একবার বাংলাদেশে যায়। দেশে গেলেই অসুস্থ হয়ে যায় বলে ওরা এখন দেশে যেতেই ভয় পায়। যে দেশে নিরাপত্তা নেই, বিদ্যুৎ নেই, স্বাস্থ্য সেবার ন্যুনতম ব্যবস্থা নেই, খাবার পানি নেই; যে দেশে আইন নেই, সরকারের প্রশাসন যন্ত্র যে দেশে বিনা বিচারে মানুষ হত্যা করে সে দেশে যেতে কারইবা মন চায়? আইনুলের ছোট ছেলে রাজীবের সাথেও কথা হল। সে অবশ্য তার বাবা বা বাবার অন্যান্য বন্ধুদের মত হতাশাগ্রস্ত নয়। প্রবাসের এই নুতন প্রজন্মের আরো অনেক বাংলাদেশী বংশদ্ভুত ছেলেমেয়েদের মতই ও বিশ্বাস করে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে নতুন ভবিষ্যৎ; তবে তার জন্য দরকার নতুন 'অনেষ্ট এন্ড ডেডিকেটেড লিডারস, নট দিজ হাফ এডুকেটেড, হাফ উইটেড, আনইমাজিনেটিভ, আলট্রা-ফ্যানাটিক রিলিজিয়াস জিলটস।'

পৌষের প্রভাতে শ্বাশ্বত বাংলা। *ছবি ঃ বনি আমিন*

আমার আরো বহু প্রবাসী বন্ধুদের মুখেই আমি আইনুল আর রাজ্জাকের কথার প্রতিধ্বনি শুনেছি; দেশে গেলে ওরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমার পরিবার মনে হয় এ ব্যাপারে ভাগ্যবান। ১৯৭৬ এর বাকশালী অপশাসনামলে দেশ ছেড়ে প্রবাসের জীবন বেঁছে নেবার পর থেকে আমরা প্রতি বছর কম পক্ষে একবার *(কোন কোন বছর একাধিকবার)* দেশে গিয়েছি; কিন্তু কেবল মাত্র দু'বার ছাড়া কখনো এমন অসুস্থ হইনি যে দেশে বেড়াতে যেতে ভয় পেতে হবে। আমি তো অসুস্থ থাকলেও বাংলাদেশে যাবার কথা মনে হলেই সুস্থ হয়ে উঠি। কি জানি, সম্ভবতঃ আমার মত নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা ছেলেরা কখনো সত্যিকার অর্থে আভিবাসিত হয় না। তবে রাজীবের কথা শুনে খুব ভাল লাগলো; সে বাংলাদেশে যেতে চায়, এমন কি সে দেশে কাজ করতেও তার খুব একটা আপত্তি নেই। তাকে

যখন জিজ্ঞাসা করলাম বাংলাদেশের মতো একটা সম্পূর্ণ অনুন্নত এবং দূর্নীতিপরায়ন দেশে কি সে থাকতে পারবে? তার সোজা উত্তর, 'পশ্চিমা দেশগুলিতে কি ফেরেশতা থাকে? কেন বাংলাদেশে কি চৌদ্দ কোটি মানুষ থাকছে না?'

কি অবাক করা সোজা সাপ্টা অথচ সত্যি কথা! আশ্চর্য জনক ভাবে এটা শুধু রাজীবের কথা নয়, বিভিন্ন সময় আমেরিকা, ইউরোপ কিংবা অষ্ট্রেলিয়ায় অভিবাসী বাংলাদেশীদের দ্বিতীয় প্রজন্মের বহু ছেলে মেয়ের মুখে আমি একই ধরণের কথা শুনেছি। এদের অনেকের মতে বাংলাদেশের এই দুরবস্থার জন্য তাদের বাবা-মা, অর্থাৎ আমরা দায়িত্ব এড়াতে পারি না। এইতো ২০০৬ এর একাডেমী অব মার্কেটিং সাইনসেস এর কনফারেনসে বাংলাদেশে বিপণন ব্যবস্থাপনা শিক্ষা তথা উচ্চ শিক্ষার নানাবিধ সমস্যার উপর একটি গবেষণা পত্র উপস্থাপনা করার পর আমাকে বাংলাদেশী বংশদ্ভুত এক তরুন গবেষক সরাসরি বলে বসলো 'তোমার কি মনে হয়না এসব সমস্যার জন্য তুমি এবং তোমার মত আত্মসর্বস্ব দেশত্যাগী আরো বহু বাংলাদেশী শিক্ষাবিদ এবং গবেষক দল দায়ী? তোমরা শুধু তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারের কথা ভেবেছো, বাংলাদেশের কথা ভাব নি ।- ডন্ট ইউ থিঙ্ক ইউ এন্ড মেনি আদার সেলফিস একাডেমিকস এন্ড রিসার্চারস লাইক ইউ আর পার্টলি রেস্পনসিবল ফর দিস? ইউ পিউপল ওনলি থট অফ ইউরসেলফ এন্ড ইওর ফ্যামিলি'স ওয়েলবিইং, নট দ্যাট অফ বাংলাদেশ।'

কথাটা তো মিথ্যা নয়। অন্যের উদাহরণ টানার দরকার নেই; আমি আমার নিজের কথাই বলি। ১৯৭৬ সালে যখন বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসি তখন আর্থিক আস্বাচ্ছল্যের দোহাই ছিল; ভাই বোনদের মানুষ করা, লেখাপড়া শেখানো, বিয়ে শাদী দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব ছিল। দেশ ছাড়ার বারো বছরের মধ্যেই আমার সে সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, কিন্তু আমার আর দেশে ফেরা হয়নি। প্রবাসের অভ্যস্ত এবং নির্ঝঞ্জাট জীবন ছেড়ে আমি বাংলাদেশের কষ্টকর জীবনে ফিরে যেতে চাইনি; একের পর এক অজুহাত খাড়া করে প্রবাসেই রয়ে গেছি। আর এ সব অজুহাত সৃষ্টি করার কারণের কোন অভাব হয়না। ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়া; তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা; দেশে গিয়ে কি করবো এমনি ধারা হাজারো কারণ সামনে এসে যায়। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা যার যার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও তো আমার একথা মনে হয়নি যে দেশকে আমার প্রয়োজন এবং সে কারণেই এখন আমার দেশে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। আমি বা আমার মতো আরো অনেকে এধরণের ভাবনার শিকার হলেও বাংলাদেশেরই কৃতি সন্তান জাফর ইকবাল কিন্তু তেমনটি ভাবেন নি; আমেরিকাতে উচ্চ পদের চাকুরীর প্রলোভন ছেড়ে হাজারো সমস্যা সংকুল বাংলাদেশে ফিরে গেছেন। আমি বাংলাদেশে বেড়াতে গেলে অসুস্থ হইনা ঠিকই, কিন্তু বাংলাদেশে গিয়ে বসবাস করা এবং নিজের মেধা ও মনন দিয়ে বাংলাদেশের সেবা করার তো কখনো ভাবিনা। আমরা বাংলাদেশের বেশীর ভাগ অভিবাসিত মানুষই নিজেকে নিয়ে থাকতে ভালবাসি। প্রবাসের নিরুপদ্রব জীবনে বসে আমরা দেশোদ্ধার করতে কিংবা হাসিনা-খালিদার পিন্ডি চটকাতে পছন্দ করি; 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' শুনে মাথা দুলিয়ে আমাদের বাংলাদেশ প্রীতি জাহির করি - সত্যি কি আমরা বাংলাদেশকে ভলবাসি?

চা-নাস্তা খেয়ে আসরের নামাজের পর আইনুলের বাসা থেকে বের হয়ে আবার মিডল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । পথে বাংলাদেশের সুপরিচিত ব্রান্ড আলাদীন সুইটস এর দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কেনা হল। আলাদীন ডেট্রেয়েটের শহরতলী এবং ড্রাইভ করে দু-আড়াই ঘন্টায় যাওয়া যায় এমন দুরত্বের আশেপাশের শহরে বাংগালী এবং পাকিস্তানী ও ভারতীয় অভিবাসীদের বাসায় এবং বিভিন্ন সামজিক অনুষ্ঠানে খাবার পরিবেশন করে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। ডেট্রয়েট এলেই নোমান এদের দোকান থেকে মিষ্টি কিনে নেয়। আজ থেকে এক সপ্তাহ পর, ২৩ সে আগস্ট, আমরা নিউ ব্রানসউইক চলে যাব বলে সোনিয়াদের বিভিন্ন বন্ধুরা নিমন্ত্রন জানিয়েছে। এদের বাসায় যাবার সময় এসব মিষ্টি নিয়ে গেলে এরা খুব খুশী হবে।

বাসায় ফিরে আমরা ডিভিডিতে একটা আফগানী সিনেমা দেখলাম। ছবিটির নাম সম্ভবতঃ 'ওসামা'; তালেবানি আমলের আফগানিস্তানে এক পুরুষ বিহীন পরিবারে নির্যাতিত মা ও তার কিশোরী মেয়ের মর্মন্তুদ জীবন কাহিনী।

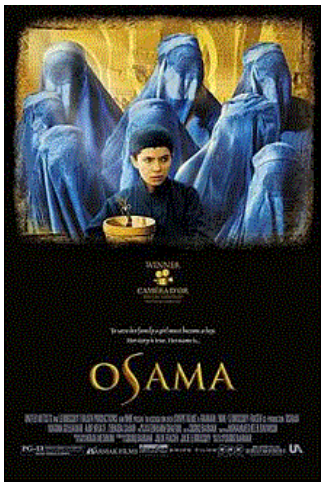

কাহিনীর মা একজন স্বামীহীনা ডাক্তার । শ্বাশুরী আর মেয়েকে নিয়ে তার তিনজনের সংসার। কিন্তু যেহেতু তালেবান সরকারের কাছে মেয়েদের একমাত্র পরিচয় অন্তপুরবাসিনী এবং পুরুষের ভোগের সামগ্রী, ডাক্তার হলেও এই মহিলার কোন কাজ করার অনুমতি নাই। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে পারিবারিক এক বন্ধুর সাহায্যে ডাক্তার মা তার কিশোরী মেয়েটিকে ছেলে সাজিয়ে বন্ধুর দোকানে কাজে লাগিয়ে দেয়। কিন্তু একদিন সরকারের এক এজেন্ট সেখান থেকে মেয়েটিকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে তালেবানি ক্যাম্পে শিক্ষানবীস হিসেবে ভর্তি করে দেয়। কিন্তু রজঃস্রাবের সময় পুরুষ পরিচয়ের মুখোশ খুলে গিয়ে মেয়েটির আসল পরিচয় ফাস হয়ে যায়। বিচারে তার প্রাণদন্ড হওয়ার কথা; কিন্তু এক নারীলুলোপ অশীতিপর বৃদ্ধ তালেবানদের ক্যাঙ্গারু কোর্টের বিচারকের কাছে তাকে স্ত্রী হিসেবে প্রার্থনা করলে সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। সেই বৃদ্ধের হারেমে বিভিন্ন বয়সী আরো বেশ কিছু নারী আছে; তাদের কাউকে কাউকে আবার তালা দিয়ে জেলখানার মত ছোট ছোট কামরায় আটকে রাখা হয়েছে। এই কিশোরী মেয়েটিও সেই হারেমের নতুন সংযোজন হয়ে যায়।

ছবি শেষ হওয়ার পর বাকহীন আমরা সবাই অনুভব করি আমাদের গাল বেয়ে উষ্ণ জলের প্রস্রবন নেমেছে। মানব ইতিহাসের বর্তমান যে অধ্যায়ে পৃথিবী নামের এই গ্রহটিতে আমাদের বসবাস, আমাদের পরম দুর্ভাগ্য সে অধ্যায়ে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রের প্রধান জর্জ বুশ নামের একজন মুর্তিমান শয়তান। এই নির্মম লোকটির অযোগ্য নেতৃত্বে এবং তার সরকার এবং সে সরকারের দোসর টনি ব্লেয়ার এবং নামসর্বস্ব সংগঠন জাতিসংঘের সহযোগীতায় তাদের সৃষ্টি মানব ইতিহাসের কলংক মোল্লা ওমর, সাদ্দাম হোসেন, বিন লাদেন, আইমান আল জাওয়াহিরি, জারকাওয়ী, আরিয়েল শারন এবং এহুদ ওলমার্ট নামক মনুষ্যরূপী দানবরাই রাজত্ব করেছে এবং করছে। ধর্মের নামে অধর্ম, আদর্শের নামে আদর্শহীনতা, সত্যের নামে মিথ্যা, ন্যায়ের নামে অন্যায় এবং সুন্দরের নামে অসুন্দরের প্রতিষ্ঠাই এদের কাজ। নিজের অজান্তেই বিধাতাকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় 'যাহারা তোমার

বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?'

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)